ভারতে স্বতস্ফূর্ত প্রতিবাদ আন্দোলনের গুরুত্ব

গণেশদত্ত পোদ্দার

১২ অক্টোবর, ২০২০

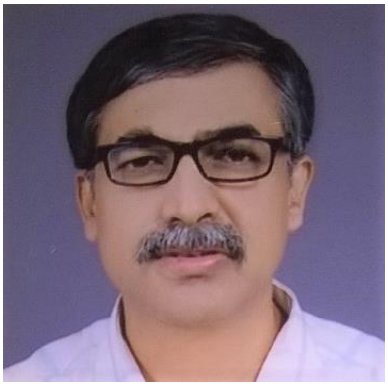

এই বছরের শুরুতেই ভারতে অনেকগুলি সুতীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন ঘটতে দেখা গিয়েছে। ছাত্রছাত্রী ও মহিলারা এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। এই আন্দোলনগুলি এমন এক সৃজনশীল রাজনীতির আরম্ভকে চিহ্নিত করে যা কিনা গণতন্ত্রের পতনকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে। এর ফলে এমন একটি মুহূর্ত তৈরি হয়েছে যখন ভারতের সুশীল সমাজের উদ্দীপনাকে উদযাপন করা প্রয়োজন। সাম্প্রতিক কালে সহসা এই জাতীয় ঘটনা ঘটে নি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, কোভিড-19 অতিমারী এবং তার ফলে মার্চ মাসে শুরু হওয়া লকডাউনের কারণে এই বিক্ষোভের আরম্ভেই ভাঁটার টান শুরু হয়।

এই স্বতস্ফূর্ত ও অসংহত আন্দোলনকে শুধু বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির পাকিয়ে তোলা বলে বাতিল করে দিলে ভুল হবে। এই আন্দোলনগুলির সূত্রপাতের প্রত্যক্ষ কারণ নাগরিকত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৯ (সিএএ)/ নাগরিক জাতীয় নিবন্ধ (এনআরসি) আর ছাত্রছাত্রীদের উপর নেমে আসা পুলিশি বর্বরতা হলেও এর গভীরতর কারণ নিহিত আছে সাংবিধানিক আদর্শের সর্বাঙ্গীণ উপেক্ষা, জনজীবনে মূল্যবোধের অবক্ষয়, ভিন্নমতের প্রতি অসহিষ্ণুতা এবং নির্বাচনে সুবিধা পাওয়ার জন্য জনগণের মনে ধর্ম নিয়ে উন্মাদনা তৈরি করার মধ্যে। সমাজের মানসে সহমর্মিতা, করুণা ও কল্পনাশক্তির বোধকে অনুপ্রাণিত করে ভিন্ন মত প্রকাশের অধিকারকে প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে ভারতের সংবিধানের অন্তর্নিহিত মুল্যবোধকে ফিরে পাওয়ার লড়াই হিসেবে এই আন্দোলনগুলিকে দেখার ও বোঝার প্রয়োজন আছে।

সম্প্রতি শাহীনবাগের একজন আন্দোলনকারী, এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে "পোষাক দেখেই আন্দোলনকারীদের চেনা যাচ্ছে", প্রধানমন্ত্রীর এই সংবেদনহীন মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করার আগে প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে যে সামান্য অগ্নিকান্ড ঘটেছিল তারপর তিনি ঠিক আছেন কিনা খোঁজ নেন। এর পর তিনি সিএএ সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে তাঁর জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্য আবার সুনিশ্চিত করেন । জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রকে একজন সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেন, "তোমার কাছে জামিয়ার তাৎপর্য কী?" এই প্রশ্নের উত্তরে ওই ছাত্র বলেন, "জামিয়া আমাকে তহজীব (পরিশীলিত সংস্কৃতিমনস্কতা) দিয়েছে, সংবিধান সম্পর্কে বোধের জন্ম দিয়েছে আর লিখতে, পড়তে এবং ভাবতে শিখিয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে আমার দেশকে বুঝতে শিখিয়েছে। আমি সারা জীবন ধরে গান্ধীজির দর্শনকে বাস্তবে পরিণত করার চেষ্টা করে যাব। আমি আমার ধর্মনিরপেক্ষ ভারতকে ফেরত চাই।" জনগণের নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতাদের রোজকার শঠতা আর কপটতার সম্পূর্ণ বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে এই আন্দোলনকারীদের অকৃত্রিমতা আর আন্তরিকতা।

চারটি বিষয়ের প্রতি আমাদের বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। প্রথমত, এই আন্দোলনগুলি এমন একটা সময়ে গান্ধীজির প্রস্তাবিত ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাকে রক্ষা করার কথা বলছে ঠিক যখন সিএএ ভারত রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতার উপর সরাসরি আক্রমণ শুরু করেছে। ভারতীয় সংবিধান নির্মাণকারিরা নাগরিকত্বদানের ভিত্তি হিসেবে ধর্মপরিচয়কে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সিএএ ধর্মপরিচয়ভিত্তিক বৈষম্যকে অনুমোদনা দিয়ে সংবিধানে রূপায়িত নাগরিকত্বের ধারণাকে উলটে দেয়। গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন যে ভিন্নধর্মাবলম্বী জনগণের পক্ষে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব। এই ভিন্নধর্মের সহাবস্থানই ভারতের আত্মিক বৈশিষ্ট্যের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেই জায়গা থেকেই গান্ধীজি ১৯৩১ সালের করাচি কংগ্রেস অধিবেশনে রাষ্ট্রকে "আমাদের দৈনিক জীবনযাত্রায় রাষ্ট্রীয়

নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করতে" আহ্বান করেছেন এবং যখন সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সমাজের শান্তিভঙ্গ করেছে তখন রাষ্ট্রের সহায়তা চেয়েছেন। সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন রাষ্ট্রযন্ত্র নিরপেক্ষ আচরণের বদলে অনেক সময়ই সক্রিয়া ভাবে শাসক শক্তির কর্মসূচীর সমর্থক হয়ে ওঠে। এর প্রমাণ হিসেবে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া এবং জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিক্ষোভের সময় পুলিশের সক্রিয়তা বা নিষ্ক্রিয়তার কথা বলা যায়।

দ্বিতীয়ত, এই আন্দোলনগুলি আরেকটি গান্ধীবাদী নীতি থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েছে। সেই নীতি অনুযায়ী বলা যায়, যে আইনগুলি সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয় শান্তিপূর্ণভাবে সেগুলির বিরোধিতা করা নাগরিকদের নৈতিক কর্তব্য। আন্দোলনের ভিত্তি হিসেবে সত্যকে অবলম্বন করা নিয়ে গান্ধীজির নিবন্ধ "সত্যাগ্রহ" থরোর *দ্য ডিউটি অফ সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স* থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। "আইনের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা ততটা কাঙ্খিত নয়, যতটা প্রয়োজন ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা।" ১৯২২ সালে ক্রমফিল্ডের বিচারালয়ে গান্ধীজির বিচার এবং ডান্ডি অভিযান – এই দুটি ঘটনাই উচ্চতর নৈতিক আদর্শের জন্য নানা নীতিবহির্ভূত আইনকে অমান্য করার ধ্রুপদী উদাহরণ। এই গান্ধীবাদী আদর্শ থেকেই মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র এবং নেলসন ম্যান্ডেলা দুজনেই তাঁদের উন্নততর ও ন্যায়সঙ্গত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম তার অনুপ্রেরণা নিয়েছিলেন। একইভাবে, ভারতের তরুণ ও মহিলারাও তাঁদের মতে যে আইনগুলি বৈষম্যমূলক এবং অন্যায় সেগুলির শান্তিপূর্ণ বিরোধিতা করছিলেন।

তৃতীয়ত, প্রজাতান্ত্রিক ভারতের ইতিহাসে প্রথমবার এই দেশের সংবিধান জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে বলে দেখা যাচ্ছে। প্রতিটি বিক্ষোভের জায়গায় প্রায় অবধারিতভাবে সংবিধানের প্রস্তাবনা একসঙ্গে পাঠ করা হয়েছে, জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়েছে, প্ল্যাকার্ডে লেখা স্লোগান একদিকে যেমন ভারতের সাংবিধানিক আদর্শকে সবার সামনে তুলে ধরেছে অন্যদিকে তেমনই শাসকদলের বিভেদ সৃষ্টির কৌশলকে বিদ্রূপ করেছে, প্ল্যাকার্ডে উঠে এসেছে ভারতের তিনরঙা পতাকা, মহাত্মা গান্ধীজি ও বাবাসাহেব আম্বেডকরের ছবি। পুনেতে একটি ছাত্রবিক্ষোভের স্লোগান ছিল, "মোদী-শাহ সাবধান, আমরা নিয়ে এসেছি সংবিধান।" এই সবই ন্যায়, মুক্তি, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শ চর্চার দিকে ইঙ্গিত করে এবং বার্তা দেয় যে সংবিধানের মূল কাঠামো বদলে ফেলার প্রচেষ্টা কখনোই মেনে নেওয়া হবে না। এর থেকে বোঝা যায় যে এই বিক্ষোভকারীরা সমাজের সমস্ত অংশকে অন্তর্ভুক্ত করে এমন এক ব্যবস্থা তৈরির পক্ষপাতী যার কল্পনা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময় দেশের সাধারণ মানুষ ও তরুণদের যৌথ চেতনায় ছিল।

অবশেষে উল্লেখ যেতে পারে, অমিত চৌধুরী যেমন বলেছেন, ভারতের সংবিধান একটি ধর্মনিরপেক্ষ দলিলের পাশাপাশি "জাতীয়তাবাদী নয়, বরং একটি মানবতাবাদী নথি।" এই আন্দোলনগুলি আমাদের সামাজিক অস্তিত্বের মানবিক দিকগুলিকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। শিখধর্মাবলম্বী কৃষকরা শাহীনবাগে এসে শিবির করে থেকেছেন এবং বিক্ষোভে শামিল মুসলিম বোনেদের জন্য লঙ্গর (শিখ মন্দিরের যৌথ রান্নাঘরে তৈরি খাবার) করেছেন। শিখ সম্প্রদায়ের এই আচরণ আমাদের মিশ্র সংস্কৃতি আর ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহ্যের মধ্যে ঐক্যের উপর বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে স্বীকার করে নেয়। শাহিনবাগের উপস্থিত একজন শিখধর্মালম্বী ব্যক্তি আবেগের সঙ্গে বলেন, "আমরা আমাদের ভাইচারা (সৌভ্রাতৃত্ব) শাসকদের কুমন্ত্রণায় ভেঙে পড়তে দেব না।"

ক্রমশ আরো খারাপ দিকে যেতে থাকা এই অতিমারী আর বাড়তে থাকা বেকারত্বের মধ্যেও গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ভারতীয় বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ ঘটতে দেখা গেছে। লোকসভা আর রাজ্যসভা, সংসদের দুই কক্ষ থেকেই অনুমোদিত দুটি কৃষি বিল নিয়ে হরিয়ানা ও পাঞ্জাবের কৃষকদের মধ্যে তুমুল অসন্তোষ তৈরি হয়। তাঁরা এই বিলদুটিকে "কৃষক বিরোধী" বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের ভয়, এই বিলদুটি কৃষকদের জীবন ও জীবিকার বিনিময়ে কর্পোরেট এবং ব্যবসায়িক স্বার্থকে এগিয়ে দেবে। ১৭ সেপ্টেম্বর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭০তম জন্মদিনটিকে দেশের নানা জায়গার বেকার যুবসমাজ রাষ্ট্রীয় বেরোজগার দিবস হিসেবে পালন করেন। ৯ সেপ্টেম্বর, রাত ৯:০৯-এ তাঁরা মোবাইল ফোনের টর্চ জ্বেলে এবং থালাবাসন বাজিয়ে দেশে বাড়তে থাকা বেকারত্বের বিরুদ্ধে তাঁদের বিক্ষোভ প্রকাশ করেন। রেলওয়ের প্রস্তাবিত বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে মেন'স ফেডারেশন (এআইআরএফ) এবং ন্যাশনাল রেলওয়ে মজদুর ইউনিয়ন (এনআরএমইউ) ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক সপ্তাহব্যাপি

বিক্ষোভসূচি পালন করেন। রেলওয়ে ইউনিয়নগুলি মনে করে যে রেলওয়ে বেসরকারি হয়ে গেলে শুধু রেলের কর্মচারী নয়, সাধারণ যাত্রীদের উপরও বিরূপ প্রভাব ফেলবে। তাই তাঁদের বিক্ষোভের আরেকটি উদ্দেশ্য এই সমস্যাগুলি নিয়ে সচেতনতা বাড়ানো এবং জনসমর্থন তৈরি করা।

হাউ টু সেভ আ কনস্টিটিউশানাল ডেমোক্রেসি বইতে টম গিন্সবার্গ আর আজিজ জেড হক নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলির বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হিসেবে জনগণের উদ্যম ও গণসমাবেশের উপর জোর দিয়েছেন। বাস্তবিকই, রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রকৃতিকে নিশ্চিত করতে মূল্য দিতে হবে সমাজকেই, তাকেই হতে হবে সদাজাগ্রত, দিতে হবে অতন্দ্র প্রহরা। ২০২০-র শুরুতে যে অসন্তোষ ভারতে প্রতিবাদ এবং গণ উদ্যমের সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করেছে তা গান্ধীজি প্রবর্তিত ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা এবং সমাজের কাঠামো পরিবর্তনের জন্য শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক আন্দোলনের উপর সুদৃঢ় বিশ্বাসকেই চিহ্নিত করে। এই বিক্ষোভগুলি সাংবিধানিক আদর্শ এবং আমাদের সভ্যতার মধ্যে নিহিত যে মানবিকতা ও সব মানুষের ও গোষ্ঠীর নির্বিশেষ অন্তর্ভুক্তি ও সবাইকে নিয়ে এগিয়ে চলার আদর্শকে ফিরে জনপ্রিয় করেছে। সাম্প্রতিক বিক্ষোভগুলি থেকে বোঝা যায় যে নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েও ভারতের নাগরিকরা যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে জনসাধারণের সমস্যা সংকট নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন এবং ক্ষমতাসীনদের কাছে থেকে দায়বদ্ধতা ও উত্তর দাবি করছেন।

গণেশদত্ত পোদ্দার পুনের ফ্লেম বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসোসিয়েট অধ্যাপক।